তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কাব্যে মিথের প্রভাব

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা কাব্যে মিথের প্রভাব

কাব্য কবিতায় মিথ :

গবেষকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রে এ কথা অনস্বীকার্য, মানুষের মনে সামষ্টিক নির্জ্ঞান প্রভাবশালী বলে কোনো গোষ্ঠীর মানুষই তাদের প্রচলিত মিথ অগ্রাহ্য করতে পারে না। কে, ইয়ুং দেখিয়েছেন, মানুষের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক বিশ্বাস গড়ে ওঠার মূলে মিথ ও রিচ্যুয়াল কী ভাবে কার্যকরী হয়েছে। কবি হলেও তিনি সামাজিক প্রাণী। অতএব তাঁর মনেও দেশাচার পুরাণবিশ্বাসের প্রভাব থাকবে। কখনও স্পষ্টভাবে কখনও আভাসে কখনও সচেতন ভাবে কখনও অবচেতনে কবির ক্রিয়াশীল মনে মিথ তার ছাপ ফেলে। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন "প্রথম দিনের উদয়দিগঙ্গনে প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে"[১] তখন তাঁর মনে বৈদিক উষা মিথ প্রতিফলিত হয়েছিল বোঝা যায়।

আবার সামাজিক সূত্র দ্বারা পাওয়া ছাড়াও মিথের মধ্যে যে অপরূপ সৌন্দর্য আছে তাও কবিদের বরণীয়। উদার কল্পনায়, মৌলিক ভাবনায়, কাহিনীর গুণে মিথ কবিদের কাছে অমূল্য খনি বিশেষ। মধুসূদন ১৫ মে, ১৮৬০ তারিখে রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন, "I love the grand mythology of ancestors. It is full of Poetry."[২] অতি আধুনিক কবিরাও ব্যতিক্রমী হতে পারেন নি। ভাষাবিজ্ঞানী দ্য সোস্যুরের মতে মাতৃভাষার ব্যবহার কাউকে প্রশিক্ষণ দিয়ে শেখাতে হয় না। এ ভাষা-গঠন-পদ্ধতি লোকে নিজেরাই শিখে নেয়। তাঁদের এই ডিপ (Deep) স্ট্রাকচার মনে রেখে দেখলে দেখা যায় মিথ গ্রহণে কবিরা নিজেদের চিন্তাবৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেন প্রতীকের মাধ্যমে। যে অনুশীলনের দ্বারা কবির মগ্নচৈতন্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রূপকল্প বা ইমেজারির সন্ধান পাওয়া যায় নন্দনতত্ত্বের পরিভাষায় তাকে বলা ডিপ স্ট্রাকচারাল স্টাডিজ (Deep Structural Studies)। কাব্যের Infra-structure যে ভাবনা তার প্রতিভাস আসে কাব্যের উপরিতলের গঠনে। এর জন্য সমালোচককে বিশেষ অনুসন্ধান পদ্ধতি জানতে হয়। পুরাতাত্ত্বিকদের মতো তাঁদের এই কাজ শিখতে হলে,

আর্কিয়োলজি যেমন সাহায্য করেছে, তেমনই কবিমনের মিথ ব্যবহারের প্রয়োগপদ্ধতি বুঝতে

আর্কেটাইপ সমালোচনা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। ফিনল্যান্ডে কাল এন্ন ও তাঁর পুত্র জুলিয়াস এন্ন এ বিষয়ে প্রথম সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা অবশ্য লোককাহিনী অবলম্বন করেই এই গবেষণা করেন। তবু পরে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে সাহিত্যেও কবিদের মগ্নচৈতন্যের অনুসন্ধানের কাজ করা হয়।

বাংলা কাব্যধারায় মিথ ব্যবহার :

পঞ্চদশ শতক থেকে বাংলা কাব্যের একটা সুনির্দিষ্ট ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ের সাহিত্যের সব থেকে বড়ো লক্ষণ ছিল ধর্মনির্ভরতা। কাজেই পুরাণ অবলম্বন করতেই হত। কাহিনীগুলি বার বার ঘুরে আসত। তবু ওঁদের মধ্যে যাঁরা প্রতিভাশালী ছিলেন তাঁরা কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতেন। যেমন কৃত্তিবাস। তিনি গৌড়াধিপতির নির্দেশে রামায়ণ রচনা করলেন, কিছু নিজস্বতাও যোগ করলেন।

হোসেনশাহী আমল বা বাংলা দেশে পাঠান শাসনকালে দেখা যায় প্রবল মুসলিম শাসক শক্তির মোকাবিলায় হিন্দুরা একত্রিত হবার সাংস্কৃতিক প্রয়াস চালিয়ে গেছে। মুসলমানরা যে দেশে রাজত্ব করেছেন, সেই দেশে প্রবলভাবে ধর্মান্তরিত করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। বাংলাদেশে কিন্তু ধর্মান্তরণ সংখ্যায় কম হয়েছে অন্যান্য দেশের তুলনায়। তার কারণ শিক্ষিত হিন্দুদের সচেতনতা। অথচ হিন্দুদের বর্ণাশ্রম প্রথা এবং নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অত্যাচারের ফলে আরও বেশি মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন । তা না হওয়ার একটা বড়ো কারণ শিক্ষিত শ্রেণী নবাবদের দরকারে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রভাবশালী কাহিনীগুলি "দেশী ভাষায়" অনুবাদ করতে লাগলেন যাতে সবাই তার রস পায়। আগে যা মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এখন তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। অন্যদিকে অন্ আর্য লৌকিক দেবতা মনসা চণ্ডী সংস্কৃত পুরাণে স্থান পেলেন। ব্যাধ বা কিরাতদের দেবী চণ্ডী হলেন মহাচণ্ডী, মহাদেবী, মনসা হয়ে গেলেন শিবকন্যা। ওদিকে ধর্মঠাকুর একেবারে আঞ্চলিক দেবতা বলে তাঁকে পৌরাণিক করা অত সহজ হয় নি। তবু তাঁর ভক্তরা কখনও তাঁকে চোখের সামনে ব্রাহ্মণ্যরূপলাভ করতে দেখলেন। কেউ দেখলেন মুসলমান সেনাপতি রূপের, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সূর্য ঠাকুর করা হল।

140421 16 MAR 2001

সুকুমার সেন দেখিয়েছেন, মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে সমাজে মহাযান উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং লোপোন্মুখ (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে ঢুকে গেছে । তিনি আরও দেখিয়েছেন মঙ্গলকাব্যগুলি যে একান্তভাবে লৌকিক জীবনের থেকে আহৃত তার প্রমাণ নায়ক-নায়িকাদের নাম । "কানু বা কানাই (কৃষ্ণ), রাই (রাধিকা), আয়ান (অভিমন্যু), গোই বা গুই (গোপী), (গোপিকা), ফুল্লরা, খুল্লনা (ক্ষুদ্র), লহনা (লোভনা), বেহুলা (বিধুরা)" ।[৩]

মধ্যযুগে লিখিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ তিনি বাঙালির মানসিকতা বুঝেছিলেন । বাঙালি পারিবারিক জীবনের ভালোবাসার বন্ধন, সেন্টিমেন্ট এবং ভক্তির পরিমন্ডল ছিল । বাল্মীকির রচনাকে কৃত্তিবাস সম্পূর্ণ বঙ্গীয় করেছিলেন ।

আবার দেখা যায় চৈতন্যদেব এক ধরনের লোকগীতিকে ভক্তিসংস্কৃতির চূড়ান্তে নিয়ে গেলেন । বাংলাকাব্যের স্তম্ভস্বরূপ বৈষ্ণবপদাবলীর মূলে আছে আভীর জাতির লোককথা ও গান । ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই । একবার মাত্র এসেছে আরাধিকা অর্থে । কৃষ্ণকে পদাবলীতে যেভাবে পাওয়া যায় তার সঙ্গে মহাভারত বা অন্য পুরাণের সংগতি নেই । হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে আছে বটে কিন্তু এগুলি বহু পরে রচিত । কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রায়-অলৌকিক জীবনচর্যা বৈষ্ণবদর্শনে পরিশোধিত হয়ে কৃষ্ণলীলা পুরাণে পরিণত হল ।

মঙ্গলকাব্যের দেবখন্ডে পুরাণ আশ্রয় করা হয়েছে । এমন-কি অনেক কবি তাঁদের কাব্যকে পুরাণ নামে অভিহিত করেছেন । বিজয় গুপ্তের কাব্য পদ্মপুরাণ, দ্বিজমাধবের চন্ডিপুরাণ, কালিকাপুরাণ নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা হয়েছে । অভয়াপুরাণ নামও পাওয়া যায় ।

ঊনবিংশ শতকের ভাবধারা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে মধুসূদন নবজাগরণের চেতনার প্রবাহ আনলেন । তাঁর প্রথম সাহিত্যকৃতি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের কাহিনী পৌরাণিক । কাব্যধারায় প্রথম আধুনিক কবি, রামকাহিনীর জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছাঁচে গড়ে তুললেন । মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ হয়ে দাঁড়ালেন নবজাগরণের বিশাল আকাঙ্ক্ষা ও সমাজশৃঙ্খলায় বদ্ধ

আত্মার যন্ত্রণার প্রতিরূপ। বিশাল তাঁর মহিমা, তেমনই নিষ্ঠুর তাঁর নিয়তি। প্রচ্ছন্ন অথচ স্পষ্ট দেশাত্মবোধ রাবণকে নায়ক করল এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের করুণাপুষ্ট রাম হলেন ভিলেন। মেঘনাদ হয়ে গেল ট্র্যাজিক হিরো, রাক্ষসদম্পতি হল রোম্যান্টিক প্রেমের আদর্শ। এইভাবে বহুপুষ্ট ভক্তির ধারণা আমূলে উপড়ে আনতে সচেষ্ট হলেন তিনি।

অন্যান্য কাব্যেও মধুসূদন মিথের চরিত্র ও কাহিনী গ্রহণ করেছেন। 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নায়িকারা পুরাণ থেকে গৃহীত। ভারতীয় পটভূমিকায় নারীর প্রেমনিবেদন বহু প্রচলিত না হলেও বিরল না। পৌরাণিক তারা, উর্বশী শকুন্তলার কাহিনীতে তার পরিচয় আছে। সে যুগে নারী স্বাধীনতা ছিল এবং ভিকটোরিয়ান রুচি আমাদের আচ্ছন্ন করে নি। এইজন্য মধুসূদনের কল্পনা বলগাছাড়া বলা যায় না। তবে বীরাঙ্গনার নায়িকাদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁর মতো আধুনিক কবির সৃষ্টি। পুরাণে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। কবিতাগুলি আরম্ভ করার আগে কবি সূত্রাকারে পুরাণের কাহিনীটি বলে নিয়েছেন। তার ফলে যে পরিমন্ডলটি দেখানো হয়েছে তার মধ্যে থেকে নায়িকার পক্ষে এ ধরনের পত্রাঘাত সংগত।

ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে মধুসূদন গ্রীক পুরাণ গ্রহণ করেছেন। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা অন্য একটি চিঠিতে তিনি দেখিয়েছেন "কি কারণে ত্যজি লঙ্কা ..... মায়াময় মায়ামৃত বিদিত জগতে"[৪] অংশে তিনি বাল্মীকি নয়, Cowper's Homer - -এর অনুসরণ করেছেন। মধুসূদন গঙ্গা-যমুনার মতো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শ মিলিয়েছেন। তাঁর মতো মহৎ কবির পক্ষে বিশ্বপুরাণকে ব্যক্তিগত করে নিয়ে ভারতীয় কাব্য ঐতিহ্যের ধারায় স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল।

ঈশ্বর গুপ্তকে গ্রীকদেবতা জানুসের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাঁর মুখ একদিকে আধুনিক কালের দিকে, অন্যদিকটি অতীতের দিকে। মূলত সামাজিক সংস্কারের জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেছেন। সূক্ষ্ম কবিকল্পনা তাঁর কাব্যে খুব পাওয়া যায় না। তাঁকে এবং 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা কেন্দ্র করে তাঁর যে ভাবশিষ্যমন্ডলী গড়ে উঠেছিল দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র - পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র মধুসূদনের সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে

পুরাণকাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করলেন। 'বৃত্রসংহার' ও 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' সেকালের অতি জনপ্রিয় কাব্য। কিন্তু তাঁরা মধুসূদনের মতো মিথ আত্মস্থ করতে পারেন নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "রেনেসাঁসের কালে প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন দেখা গেল। নবজাগ্রত রোমান্স-উত্তেজিত বাঙালি গ্রহণ করল পুরাণ কাহিনী (তিলোত্তমা সম্ভব, বৃত্রসংহার, দশমহাবিদ্যা), রামায়ণ কথা (মেঘনাদ বধ) এবং মহাভারত কথা (রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস) প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখাইল।"[৫]

বিহারীলাল চক্রবর্তীর আত্মমগ্ন গীতিকবিতা রচনার পূর্ব সময় পর্যন্ত আখ্যানমূলক কাব্য লেখা হয়েছে এবং পুরাণে যে সব অপূর্ব কাহিনী আছে সেগুলি সহজেই কবিদের আকৃষ্ট করেছে। নতুন কাহিনী সৃষ্টির প্রয়োজন হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম কবি যিনি পুরাণকে অনুষঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করলেন। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মিথের কাহিনী গ্রহণ না করে, একটি মাত্র শব্দাংশ ব্যবহার করে মিথিক ভাব নিয়ে এসেছেন। যেমন বিজয়িনী [৬] কবিতার 'অচ্ছোদ সরসী নীরে' বাক্যাংশটুকু ব্যবহারে বানভট্টের মহাশ্বেতার কথা মনে আনবে। আবার কোথাও শুধুই ভাব সাদৃশ্যে, 'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া'[৭] একাধারে জীবনের সংঘাত ও মহত্ত্ব দেবভাবনায় জীবনের কাব্যে গ্রহণ করেছেন। জবালা-সত্যকাম[৮] নারদ, বাল্মীকি[৯] চরিত্র নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কোথাও সম্পূর্ণ নবায়ন হয়েছে। 'মদনভস্মের পর'[১০] আধুনিক কবি দেখেন মদনের দেহগত মৃত্যু হল, কিন্তু তার ভস্ম বিশ্বে পড়ল সেখানে জেগে উঠল নতুন প্রেমচেতনা,

"কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরু পল্লবে,
ভ্রমর ওঠে গুঞ্জরিয়া কি কথা !
ঊর্ধ্বমুখে সূর্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা !

'মহাকাব্য পুরান তো বটেই বেদ, উপনিষদীয় চরিত্র, বৈষ্ণব বৌদ্ধ ধর্ম থেকেও তিনি প্রত্নপ্রতিমা অকাতরে গ্রহণ করেছেন। দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের অন্তর্নিহিত উর্বরতাবাদের মিথ বিষয়ক রূপক চরিত্র অহল্যা প্রত্নপ্রতিমা গ্রহণ করেছিলেন।

'মানসী' কাব্যে 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অভিনব প্রকৃতিচিন্তার সঙ্গে প্রস্তরীভূত অহল্যার অনুভূতি মিলিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করেছেন। অহল্যা ও ইন্দ্র সম্পর্কের কলুষতা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে মাটির অন্তর থেকে উদ্ভূত একটি প্রাণময় বিকাশের মানবীরূপ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচিন্তার মধ্যে যে অভিনবত্ব দেখা যায়, তা হল শুধুমাত্র নিসর্গদৃশ্যের শোভা সৌন্দর্যের বর্ণনামাত্র নয়। তিনি নিজেকে এই পৃথিবীর সঙ্গে একেবারে একাকার করে নিতেন। "এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার ওপর সবুজ ঘাস উঠত ..... যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে .....[১১] অনুরূপ চিন্তার প্রতিফলন ছিন্নপত্রের ৬৭ সংখ্যক পত্রেও।[১২] তাঁর 'উৎসর্গ' কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতা বা 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে এই যে অঙ্গাঙ্গী মিলনের কথা –

'মনে হয়, যেন মনে পড়ে
তখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাতভুবন ভ্রূণ মাঝে ....' (সমুদ্রের প্রতি)[১৩]

এরই ভাবসাযুজ্য অহল্যার ঘটনায়। সেও পৃথিবী[১৪] অন্তরে ছিল এবং ভ্রূণ যেমন পরে বিস্মৃত হয় কিন্তু তখন তার অনুভূতি কেমন হতে পারত এর জন্যে রবীন্দ্রনাথ ভাবগত আত্মীয়তার ভাব পোষণ করেছিলেন বলে পৌরাণিক চরিত্রটি গ্রহণ করেছিলেন।

দ্রষ্টব্য, এখানে গ্রীক মিথ ভেনাসও কবির মগ্নচৈতন্যে কার্যকরী ছিল। কারণ এখানে তিনি অহল্যার নবজন্ম মুহূর্তটিতে তাকে বিবসনা বলে কল্পনা করেছেন, যা ভারতীয় ঐতিহ্য-বিরোধী। এই প্রসঙ্গে বতিচেলি-অঙ্কিত ভেনাসের জন্ম ছবি স্মরণযোগ্য। ভেনাসও সরল সৌন্দর্যের প্রতিরূপ। অহল্যা এখানে রূপে পূর্ণযৌবনা, কাল বিবেচনায় শিশু। তাই হয়তো নগ্নিকা মূর্তি রবীন্দ্রকল্পনায় স্থান পেয়েছে। না হ'লে ভারতীয় পুরাণে অন্ আর্য কালী ব্যতীত কোনো নগ্নিকা স্ত্রী মূর্তি কল্পনা করা হয় না। সমুদ্র মন্থনে উত্থিতা লক্ষ্মী ও উর্বশী সর্বাঙ্গ ভূষিতা, সালংকারা। তাই এ ধারণা গ্রীক মিথ থেকে রবীন্দ্র মানসে এসেছিল মনে হওয়া অসংগত নয়।

শুধু 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় নয় এই মিথটি তাঁর রচনায় নানা রূপে দেখা দিয়েছে। 'শাপমোচনে'র নিম্নোদ্ধৃত গানটি শুনে মনে হয় এ যেন রামের কাছে অহল্যার প্রার্থনা,

পাষাণ আমার কঠিন দুখে তোমায় কেঁদে বলে
পরশ দিয়ে সরস করো, ভাসাও অশ্রুজলে
ওহে সুন্দর হে সুন্দর ।
শুষ্ক যে এই নগ্ন মরু নিত্য মরে লাজে
আমার চিত্ত মাঝে
শ্যামল রসের আঁচল তাহার বক্ষে দেহ টানি
ওহে সুন্দর হে সুন্দর ।

প্রকৃতপক্ষে রামায়ণ রবীন্দ্রনাথের আবাল্য প্রিয় কাব্য। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে তাঁর পড়াশোনার প্রথম স্মৃতি উদ্ধার করতে গিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণের নাম করেছেন। এই স্মৃতি উদ্ধারের ছবিটি আছে 'যাত্রাপথ' কবিতায় [১৫] "একালের সাহিত্যের জহুরীরাও রামকথার মধ্যে রূপকথার কাঠামো লক্ষ্য করেছেন। .... হয় তো এই মোটিফগত সাদৃশ্যের জন্য যাত্রাপথ কবিতাটির পাশাপাশি রূপকথা এসে দাঁড়িয়েছে।"[১৬]

এছাড়াও ভৃত্য শ্যাম কর্তৃক লক্ষ্মণের গণ্ডী কেটে শিশুকে আটকে রাখা, ভৃত্য ঈশ্বরের মুখে রামায়ণের গল্প শোনা, কিশোরী চাটুজ্যের দাশুরায়ের পাঁচালি গান, সবমিলিয়ে শৈশবে রামায়ণ গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এইজন্য রামায়ণ কাহিনী নিয়ে অনেক কবিতা আছে। 'অহল্যার প্রতি' ছাড়াও, ভাষা ও ছন্দ, পতিতা, চৈতালির অন্তর্গত একটি সনেট 'বনে ও রাজো'। মানসীর 'কুহুধ্বনি'তেও রামায়ণের করুণ কাহিনী মিশে গেছে। 'সোনার তরী'র 'পুরস্কার' কবিতাতে রামায়ণের তিনটি সংকট মুহূর্তের ছবি আছে। রামের বনগমনের দিনটি, লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার অযোধ্যা ছেড়ে যাবার দু:খের সময়টি ও মৃগহত্যায় অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসে সীতাকে কুটিরে দেখতে না পাওয়ায় রামের হাহাকার। 'মায়ামৃগ' চিন্তাও কখনও তাঁর কাছে নাগরিক জীবনের অর্থলোলুপতার প্রতীক ('চিত্রা' কাব্য 'নগর সংগীত') কখনও মুক্তির উৎকণ্ঠার প্রতীক, চিরপলাতক রহস্যরোমাঞ্চময় জীবনের পিছনে স্বাধীন অনুসরণের প্রতিমান - 'তোরা যে যা বলিস ভাই / আমার সোনার হরিণ চাই'(রাজা নাটক, ১৩১৭)।

রবীন্দ্রনাথের সমসময়ে বাংলা কবিতা যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রপ্রভাব উত্তীর্ণ হওয়া সহজ ছিল না। যে প্রচণ্ড প্রতিভার তাপ আজ পর্যন্ত কবিগণ অগ্রাহ্য করতে পারছেন না; সে যুগে তা কত অসম্ভব ছিল অ সহজে অনুমান করা যায়। এই পর্বের অসংখ্য কবির মধ্যে কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং কাজী নজরুল ইসলাম। দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁর বলিষ্ঠ দেহবাদ ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর বাস্তব-সচেতনতা ও দু:খবাদের জন্য রবীন্দ্রানুসারী কবিদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যলাভ করেছেন। এঁরা কেউই পুরাণ-নির্ভর ছিলেন না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তির্যক দৃষ্টিতে জীবনকে দেখতেন এবং এই প্রসঙ্গে বারবার রবীন্দ্রদৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেছেন। এঁরা সফল কবি, হলেও যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি নন।

রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক বাতাবরণের পর মোহিতলালের কামের বিজয় ঘোষণা, নজরুলের প্রবল প্রাণস্ফূর্তি নিয়ম ভাঙার আনন্দ ('দে গোরুর গা ধুইয়ে') অজস্র ফার্সি উর্দু শব্দের ব্যবহার এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দের কারুকর্ম এক অভিনবত্বের আস্বাদ আনে। ফলে এঁদেরই রবীন্দ্রপরবর্তী কবিদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি বলা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্নেহের প্রকাশ দেখি অল্প বয়সে মৃত্যুর পর, কবিগুরুর শোকের ভাষায়। নজরুলকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ফাল্গুনী' নাটকটি উৎসর্গ করেন 'বসন্তের অগ্রদূত' বলে। মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁর।

রাজনৈতিক জটিলতায় নজরুলকে একটি রাষ্ট্রের জাতীয় কবির সম্মান দেওয়া হয়েছে। নজরুল তুচ্ছ সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে অবস্থান করতেন। তাঁর শাক্তগীতি তো ভক্তির গভীরতায় মহিমান্বিত। রাধাকৃষ্ণ শিব-কালীর সঙ্গে জগুলুল, ইদ প্রসঙ্গ একই ভাবে এসেছে। দেখা যায় একসঙ্গে বিনা দ্বিধায় নজরুল বলছেন,

"আভীর বালারা দুধাল গাভীরে দোহায় না, কাঁদে শুয়ে
দুম্বা শিশুরা দূরে চেয়ে আছে, দুধ ঘাস নাহি ছুঁয়ে" (চিরঞ্জীব জগলুল)[১৭]

এই মানবতাবাদ নজরুলের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাঁর বিশেষ পঙ্‌ক্তি

"আমি বজ্র, আমি ঈশান বিষাণ ওঙ্কার
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার। (বিদ্রোহী)[১৮]

নজরুলের মিথব্যবহারের একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে যখন তাঁর বক্তব্য গম্ভীর ও চড়া সুরে বাঁধা তখনই পুরাণের প্রয়োগ হয়েছে। বিদ্রোহী কবিতার পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে তাঁর উল্লেখ, সাম্যবাদীর স্তবকে স্তবকে পুরাণের পুনঃস্মৃতিচারণ। ভাব-গত ছাড়া বিষয়-গত দিক থেকেও এর ব্যতিক্রম নেই। 'সত্য কবি', 'ইন্দ্র-পতন' কবিতা দুটি যথাক্রমে সত্যেন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত। এখানে মহিমা বোঝাতে পুরাণের দ্বারস্থ হয়েছেন কবি —

'মর্ত্য-ইন্দ্র বসিবে গো আজ স্বর্গ-ইন্দ্র কাছে' অথবা

"দুলিছে বাসুকি মণিহারা ফণী
দুলে সাথে বসুমতী
তাহার ফণার দিনমণি আজ
কোন গ্রহে দেবে জ্যোতি। (ইন্দ্র-পতন)[১৯]

এবং

'উন্নত শির কামজয়ী মহাকাল হয়ে জোড়পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি।' (সত্য কবি)[২০]

ভাবগম্ভীর বাতাবরণ তৈরি করতে মোহিতলাল মজুমদার এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরাণের আশ্রয় নিয়েছেন।

সত্যেন দত্তের 'বঙ্গজননী'[২১] ত্রিশূল কেন ধরায় ধূলা আছে চুমি
কে মা তুই কে মা শ্যামা .....

অথবা 'নমস্কার' কবিতা শ্রী-রূপে কমলা ছায়া সম যার। আদরে ও অনাদরে
মালা দিল যারে সরস্বতী সে। আপনি স্বয়ম্বরে[২২]

'রাজা-কারিগর' জাতীয় কবিতাতেও এ জাতীয় পুরাণ উল্লেখ প্রচুর। আবার সম্পূর্ণ ভাবে পুরাণাশ্রিত বিষয়ের ওপরেই কবিতা রচনা 'মহাসরস্বতী', 'কয়াধু', 'বড়দিনে', 'সিংহবাহিনী', 'আখেরী', 'গিরিরাণী', 'মহাদেব' ইত্যাদি। পুরাণের রস ও সৌন্দর্য তাঁকেও আকৃষ্ট করেছিল। উল্লেখযোগ্য এই যে তাঁর পরিহাসকেন্দ্রিক কবিতাতেও পুরাণ এনেছেন তিনি। উদাহরণ স্বরূপ 'অম্বল-সম্বরা-কাব্য'। অতিতুচ্ছ বিষয়কে বিশাল বাক্য ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে সজ্জিত করা হয়েছে।

এই বৈপরীত্যের জন্য এখানে হাস্য রস সৃজিত হতে পেরেছে। মিথ অবলম্বনের উদ্দেশ্য ভিন্নতর, কিন্তু সার্থক -

বোম্বাইয়ের আঁটি ফেলি বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা
সুদূর শহরে হোথা চেম্বারে চেম্বারে
হাসিল গ্রাম্ভারি যত জজ।

তাঁর ক্ষেত্রে বলা বাহুল্য পাঠক অনেক বেশি রসাস্বাদন করে যখন পড়ে —

"লম্বোদরী
হাঁচিলা হিড়িম্বা বনে, শাম্ব দ্বারকায়,
গোপাঙ্গনা ভুলিলা দম্বল দিতে দইয়ে।"

তবে আজও সত্যেন দত্ত যেসব কবিতার জন্য পাঠক মনে বেঁচে আছেন তাঁর সেই 'পাল্কীর গান' বা 'সবুজপরী', 'জর্দা পরী', 'পাগল ঝোরা' ইত্যাদিতে কিন্তু মিথ ব্যবহার নেই বললেই চলে।

মোহিতলাল মজুমদারকে রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের কবিগণ এককালে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলছেন, "মোহিতলালকে আমরা আধুনিকতার পুরোধা মনে করতাম। এক কথায় তিনি ছিলেন আধুনিকোত্তম। ..... আধুনিকতা যে অর্থে বলিষ্ঠতা, সত্যভাষিতা সংস্কারসাহিত্য তা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর কবিতায়"।[২৩] তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ভাবগাম্ভীর্য এবং এই ভাবপ্রকাশের জন্য পুরাণ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। 'পুরুরবা', 'নাগার্জুন' প্রভৃতি যেমন তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তেমনই বক্তব্য সুপ্রকাশ করার জন্য নানা কবিতায় অজস্র পুরাণোল্লেখ দেখা যায়। ধরা যাক 'পাপ' কবিতাটি।[২৪] পৃথিবীতে পাপের উৎস দেবতাদের সাগরমন্থনে দানবদের প্রতি শঠতা —

"দানবের আশা বিফল করিতে দেবতা গড়িল ধরা
লুকায়ে রাখিল অমৃত ভান্ড, জীবনে আনিল জরা।"

এবং 'তবু যে ভুলিতে পারিল না আজও দানবের রোষ ভয়' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তিতে এই পৌরাণিক কাহিনীটি রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

তাঁর কাব্যের শব্দের সুচয়ন, সুতীব্র অথচ বেগবতী ধারা দ্বিতীয় দশকের বাস্তবতা সন্ধানী বাঙালি পাঠক চিত্তকে জয় করেছিল এবং বিশিষ্টতা দিয়েছিল।

কিন্তু তবু বলতেই হয় এই তিন কবিই বহুভাবে মিথ ব্যবহার করলেও পুরাণকে আভাসিত করে কোনো নবজীবন সত্যের সন্ধান দিতে পারেন নি। অনেক সময় মনে হয় বাংলায় অনুবাদ মাত্র করা হচ্ছে যদিও এর মধ্যে কবি বলছেন জন্ম দিয়ে কোনো মানুষকে বিচার করা যায় না —

স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচী-পুত্র হল মহাবীর দ্রোণ
কুমারীর ছেলে বিশ্বপূজ্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
কানীন-পুত্র কর্ণ হইল দানবীর মহারথী
স্বর্গ হইতে পতিতা গঙ্গা শিবেরে পেলেন সতী। (মহামানব)[২৫]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির শেষদিকে যে আধুনিক কবিরা বাংলা সাহিত্যে এলেন তাঁরা 'কল্লোল', 'কালিকলম' পত্রিকায় সচেতনভাবে বিপরীত কাব্যধারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু বস্তুত এঁরাও ছিলেন একান্তভাবে রবীন্দ্রঅনুরাগী, ব্যক্তিগত জীবনেও রবীন্দ্রভক্ত। এর পুরোধা কবি বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রস্নেহসান্নিধ্যে পুষ্ট। বিদ্রোহ ঘোষণায় কোলাহলই যখন বড়ো হয়ে উঠল তখন তাঁরা মনে মনে উপলব্ধি করলেন রবীন্দ্রনাথকে অগ্রাহ্য করে নয় তাঁকে স্বীকার করেই স্বকীয়তা অর্জন করতে হবে। এই উপলব্ধির মাটি থেকেই নিজস্ব অভিব্যক্তিতে ব্যক্ত হলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে আরও অনেকে।

কিন্তু কালের প্রভাবেই রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কবিরা সরে এলেন। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, ব্ল্যাকআউট, মানুষের নির্লজ্জ লোভের প্রকাশ, তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ের লালসাময় অর্থগৃধনুতা প্রকাশ করল সভ্যতার অবক্ষয়িত চেহারা, একাকিত্বের যন্ত্রণা, জীবনের জটিলতা। প্রাচীন মিথের শান্তি ও সৌন্দর্যের ভিতর তাঁরা দেখলেন সেখানে আছে নিয়তির অনড় বিধান। আধুনিক জীবন ও আদিম জীবনের মধ্যে অন্ধকারের যে যোগসূত্র আছে তার দ্বারাই বর্তমান তমসার সেতু বন্ধন করা যায়। উক্ত কবিগণ সকলেই ইংরিজি ও নানা বিদেশীভাষার সঙ্গে পরিচিত ও পাশ্চাত্যশিক্ষায় দীক্ষিত। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতার মুখবন্ধে বলেছেন কত বড় বয়স পর্যন্ত সুধীন্দ্রনাথ ভালো করে বাংলা লিখতে পারতেন না এবং তাঁর নিজের প্রথম যৌবনের গ্রন্থ 'যে দিন ফুটলো কমল'[২৬] এর ভাষা ইংরিজিগন্ধী বলে

রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছিলেন । পেশাতেও এঁরা ইংরাজি ভাষাকে বরণ করেছিলেন অধ্যাপনা বা সাংবাদিকতার মাধ্যম রূপে ।

যুগযন্ত্রণায় নিপীড়িত এই কবিরা মিথের দ্বারস্থ হয়েছেন । তার কারণ এর মধ্য দিয়ে তাঁরা তাঁদের দ্বন্দ্ব-দীর্ণ চৈতন্যকে কালোত্তীর্ণতায় উপনীত করতে চেয়েছেন । রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরা মিথের মধ্যে চিরকালীন মূল্যবোধ খুঁজে পান নি । বরং পাশ্চাত্য নৃতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকদের নির্দেশিত পথে প্রাচীন মিথের ভিতর দিয়ে নিজস্ব মনোভাব প্রতিক্ষেপণ করেছেন । এদিক থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিশেষত এলিয়ট, জয়েস, টমাস মান তাঁদের আদর্শ । তাঁরাও তাঁদের মানসিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করে তোলবার জন্য মিথ আশ্রয় করেছেন । এর ভিতর দিয়ে শান্তির আশা করেন নি । মিথের মধ্যে মানুষের নিয়তির যে অলঙ্ঘ্য বিধানের কথা আছে, বর্তমান মানবসভ্যতাতেও সেই নিয়ন্ত্রক শক্তি তাঁরা অনুভব করেছেন । যেমন জয়েসের ইউলিসিসের নায়ক সাধারণ করণিক হয়েও সেই মহাবীরের মতো সাংকেতিক প্রতি-তুলনায় জীবন মহাসমুদ্রের ঝড়ঝঞ্ঝায় ক্রমাগত আবর্তিত হয়েছে । এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'র মূলে উর্বরতাকেন্দ্রিক মিথ প্রতিফলিত হয়ে অন্য একটি বিস্তার লাভ করেছে । তিনি 'ইউলিসিস' সম্বন্ধে বলেছেন, "মিথিক্যাল ওয়ে" ব্যতীত যুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত সভ্যতার জটিল জীবনজিজ্ঞাসা "ন্যারেটিভ ওয়েতে" বর্ণনা করা সম্ভব নয় ।

ইয়েট্‌স্ ও রিলকেও মিথের দ্বারা আধুনিক কবিতা সমৃদ্ধ করেছেন । ইয়েট্‌সের 'দি টাওয়ার', 'লিডা ও হংস', একটি নাটকের দুটি গান ও রিলকের অরফিউসের প্রতি সনেট কবিতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ।

রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগেও তিনজন কবিকে প্রতিনিধিস্বরূপ এই প্রসঙ্গে গ্রহণ করা যায় । বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে । এই তিনজন সর্বাংশে পাশ্চাত্য কাব্যধারার সঙ্গে প্রাচ্যভাবনার মেলবন্ধনে আগ্রহী ছিলেন । সর্বোপরি যুগোপযোগী বিষাদ ও তীক্ষ্ণ হতাশা ও যন্ত্রণা এঁদের কাব্যে প্রখর ভাবে উদ্‌ভাসিত । বিশ্বব্যাপী ভাঙনের প্রভাব তাঁদের কাব্যচিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে । অন্যান্য কবিগণ যে এই আগুনের আঁচ থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিলেন তা নয় । কিন্তু এই তিনজনই মিথকে বর্তমান সভ্যতার পরাভবের, আত্মিক মূল্যবোধ যাচাইয়ের

মানদণ্ড হিসাবে বারবার গ্রহণ করেন।

আবার, এই তিনজনের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর কাব্যে প্রথমাবধি মিথের প্রভাব দেখা যায়। এর সর্বাঙ্গীণ রূপও তিনিই দেন পরবর্তী জীবনে কাব্যনাট্যগুলির মধ্যে। তাঁর প্রথম পর্বের কাব্য 'দ্রৌপদীর শাড়ি'তে কুটিল মানুষের স্বার্থান্ধতার জন্য প্রাকৃতিক অবক্ষয় ঘটবার চেষ্টা থাকলেও প্রকৃতি অফুরন্ত ভাবে তার সৌন্দর্য জুগিয়ে যাচ্ছে এ বিশ্বমত তিনি প্রতিফলিত করেছেন। দময়ন্তীর প্রেম কাহিনী নির্বাচন করেছেন, সীমায়ীতি সত্ত্বেও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর পরিণত জীবনে প্রাচীন ভারতের ক্লাসিক্স্-এর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন বিশেষভাবে তুলনামূলক সাহিত্য পঠন-পাঠন সূত্রে। মহাভারত সম্বন্ধীয় আলোচনা, মেঘদূতের অনুবাদে তার ফলশ্রুতি। তাঁর কবিকৃতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর কাব্যনাটকগুলি। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, রাম বসু, মোহিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য কবিগণও এই মাধ্যমটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর মতো এত সযত্ন ব্যবহার আর কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি সব মিলিয়ে আটটি কাব্য লিখেছেন। তার মধ্যে দুটি অনুলেখন। অন্য ছয়টি মৌলিক কাব্যনাট্যের পটভূমি পুরাণ। 'কালসন্ধ্যা' নাটকে কৃষ্ণের জীবনের শেষ পর্ব, যেখানে তাঁর সাক্ষী থাকতে হয়েছে নিজেরই আত্মীয়দের মধ্যে হানাহানিতে বংশলোপ দেখতে। 'সংক্রান্তি' নাটকে দুর্যোধনের মৃত্যুতে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর প্রতিক্রিয়া, 'প্রথম পার্থ'তে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকমুহূর্তে কর্ণের জীবনের বেদনাদায়ক পরিস্থিতি, 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী' কাব্য নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গ জীবনের নব উপলব্ধি, 'অনাম্নী অঙ্গনা'তে বিদুরের জন্মবিষয়ক ঘটনা, 'কলকাতার ইলেকট্রা' গ্রীক পুরাণ-প্রভাবিত। ইয়েটসের কাব্য নাট্য 'পারগেটরী' 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে এবং কোম্পারা মোতায়াসুর 'নো' নাটকে 'ইক্কাকু সেনিন' অনুবাদ করেন। এটিরও বিষয়বস্তু কিন্তু ঋষ্যশৃঙ্গ।

'কলকাতার ইলেকট্রা' নাটকটি গদ্যাকারে রচিত। অতএব বাংলা কাব্য আলোচনা কালে এটি বর্জন করা যায়। 'সংক্রান্তি'[২৭] নাটকে 'গান্ধারীর আবেদনের' প্রভাব স্পষ্ট। বিশেষ করে গান্ধারীর ঋজুতা ও সত্য অনুসন্ধিৎসা। এখানে দুর্যোধনের মৃত্যু সংবাদে গান্ধারী আবার নবজাতক ক্রোড়ে মাতৃরূপে ফিরে আসেন। শাশ্বত মাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি। এখন দুর্যোধন সমস্ত সমালোচনার ঊর্ধ্বে। 'গান্ধারীর আবেদনে'র পরের অংশ বলা চলে এটিকে।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্য 'অনাম্নী অঙ্গনা'[২৮] একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। রামায়ণ মহাভারতে কাব্যে যে উপেক্ষিতা যে-সব মহিলারা আছেন তাঁর থেকে বুদ্ধদেব বসু নির্বাচন করলেন বিদুর জননীকে। মহাভারতের অন্যতম প্রধান চরিত্র বিদুর। তিনি ধর্মের প্রতিগ্রহ। আধুনিক বহু সমালোচকের মতে তিনি যুধিষ্ঠির-জনক। ডা দীপক চন্দ্র 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম' গ্রন্থে এই সত্য প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় দেশ পত্রিকায় প্রতিভা বসুর 'মহাভারতের মহারণ্যে'[২৯] বইটি পর্যালোচনা কালে কৌষীতকি উপনিষদের অনুশাসন ২-১২/৪ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ উদ্ধৃত করে এই মত সমর্থন করেছেন। এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি অনেকগুলি যুক্তি প্রয়োগ করেছেন, যার থেকে মনে করা যায় ব্যাসদেবের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে যম বা ধর্মই বিদুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্র।

এমন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের গর্ভধারিণী সম্বন্ধে মহাভারতকার নীরব। তিনি শূদ্রানী ছিলেন বলেই কি ? আধুনিক কবি তাঁকে নতুন করে প্রকাশ করলেন। তিনি এক অঙ্গনা অর্থাৎ নারী মাত্র এবং এতই হতমানের যে একটি নামকরণেরও প্রয়োজন হয় নি। সে ব্যাসদেবের শয্যাভাগিনী হতে রাজী হয়েছিল এর বিনিময়ে দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে বলে। কিন্তু স্বাধীনতা-প্রলোভিতা নারীটি মাতৃত্ব চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে সন্তানের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিল।

'ব্যাসের পুত্র — সে অন্য কারো নামে পরিচিত হবে।
লালিত হবে অন্য কোন সংসর্গে
আমার পক্ষে এই চিন্তা অসহ্য'।

শুধু তাই নয়, এই পুত্রকে উপযুক্ত করে তোলার মধ্যে সে নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়,

"না, দেবী, পুত্রের জন্য নয় —
আমার নিজেরই জন্য। আমি দেখতে চাই
সে,
নম্র, মৃদুভাষী, ধীর .....
....
আমারই স্মরণ চিহ্ন, আমার প্রমাণ, আমার বিজ্ঞান।"

এরই সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে উর্বরতা-কেন্দ্রিক মিথের ভাব। এ বিষয়টিতে কেন জানি না কোনো সমালোচক আলোকপাত করেন নি। অঙ্গনা ব্যাসদেবের সঙ্গে তার রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে —

"দেবী, তাঁর গন্ধে আমি বিবশ হয়েছিলাম —
এক মিশ্রিত গন্ধ ....
সেই মাটির ঘ্রাণ, যা এইমাত্র হলকর্ষণে জীর্ণ হলো।"

আবার পাওয়া যায় "যেন কর্ষিত বীজপূর্ণ ধান্যক্ষেত্র"

..... ততক্ষণে আমাকে নিজের মধ্য থেকে উৎক্ষিপ্ত করে ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি — যেন নবান্নের ধান।"

শূদ্রানীর মধ্যে কর্ষিত ক্ষেত্র, শস্য, বীজ এসবের তুলনা আসাও স্বাভাবিক। এখানে বুদ্ধদেব বসু সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

এলিয়ট যেমন নানা মিথের অংশ গেঁথে কাব্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন তার সচেতন অনুসরণ করেছেন বিষ্ণু দে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'[৩০] নামকরণ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথ একাত্মতার প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি তাঁর কাব্যে এই দুইয়ে মিলে একটি বিশিষ্ট রস সৃজিত হত, হতাশ হতে হত না। কিন্তু তিনি এলিয়টের মতো বিভিন্ন মিথের একাত্মীকরণ করতে পারেন নি। তাঁর কাব্যে মনে হয় চমকসৃষ্টি বড়ো কথা, নামকরণের অভিনবত্বে। তাঁর একটি স্মরণযোগ্য কবিতা 'ক্রেসিডা'। গ্রীক মিথের এই নিষ্ঠুরা, চতুর প্রণয়িনী, ট্রয়লাসের প্রেম গ্রহণ করেন নি। কবি স্বয়ং এখানে ট্রয়লাস। কিন্তু তিনি তাঁর মতো উন্মাদ হয়ে যান নি। "উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।" তবে ট্রয়ের যুদ্ধের স্মৃতিচারণে কবির হৃদয়ে ছবি জেগেছে 'কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথের ধূলি।'

বিষ্ণু দে সার্থকভাবে পুরাণকে বর্তমানের জটিল ভাবনায় চিত্রিত করেছেন তাঁর পদধ্বনি কবিতায়। এ প্রসঙ্গটি বিস্তারিত ভাবে পরের অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

পাঠকমহলে বিষ্ণু দে'র মতো সুধীন্দ্রনাথ দত্তও বিতর্কিত কবি। তাঁদের ভাষার

অস্বচ্ছতা, বওনব্যের ইচ্ছামতো প্রসার ও সংকোচন এবং বিদেশীয় মোটিফ গ্রহণ সাধারণ পাঠকদের অস্বস্তির কারণ হয় । সুধীন দত্ত মনে করেন পাঠককেও দায়িত্বশীল হতে হবে, তাঁরও পূর্বপ্রস্তুতি পঠন-পাঠন প্রয়োজন । তিনি ক্লাসিকাশ্রিত রচনার পক্ষপাতী এবং আবেগের থেকে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন । তিনিও অজস্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথ গ্রহণ করেছেন, সম্পূর্ণ কবিতায় এবং কবিতার অংশে ।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অন্যতমা নায়িকা মহাশ্বেতা । 'নরক', 'পুত্রেষ্টি', 'উর্বশী' কবিতায় আছে মিথের প্রতিভাস ।' শকুনির ক্ষুধা নিবারণে / শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভনে ' 'সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসূরে ক্ষমিতে শেখাও অপরের অপঘাত । '

অথবা "বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে
মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস"

সুধীন্দ্রনাথের 'জেশন' কবিতাতেও জড় ও চৈতন্যের সংগ্রাম স্পষ্ট । চৈতন্য জড়ের বিরোধী, এবং বিশ্ব জড় পদার্থ । অতএব বিশ্বের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামই সচেতন মানুষের জীবন । এই যুদ্ধের প্রতীক রূপে কবি বেছে নিয়েছেন সাঁতার ও নৌচালনা । 'জেশন' কবিতা (সংবর্ত কাব্য) প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বলছেন 'বহুকষ্টে শিখেছি সাঁতার' । এই সাঁতার ও নৌচালনা মিথিক্যাল বিন্যাসের ফলে প্রতীকমূল্যে অনেক ব্যাপ্তি লাভ করেছে যা সাধারণ সন্তরণ বর্ণনায় হতে পারত না । জেশনের জীবন সংগ্রামের মধ্যে 'ভবিতব্যে ভারাতুর' জীবন দর্শনের কথা প্রস্ফুটিত হতে পারত না ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এই যুগের অন্যতম বিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি । তিনি যে-সব মিথ গ্রহণ করেছেন সেখানে পৌরাণিক চরিত্রে আধুনিকতা আরোপ করেছেন । যেমন পৌরাণিক রাবণকে মহৎ রূপে দেখিয়েছেন । এখানে রাবণ প্রেমিক । তিনি সীতাকে অপহরণ করেছেন কিন্তু কোন বাধা না থাকলেও তাকে সবলে গ্রহণ করেন নি, সীতার সম্মতির জন্য অপেক্ষা করেছেন । তিনি কেবল আকারে নয়, হৃদয়েও বিশাল । 'হৃদয়ের এ সম্মানে / রামায়ণ অন্য দীপ্তি পায়' । 'ছোট ভীরু হাত দিয়ে / জীবনের মাপ নিয়ে যারা' থাকে তারাই একমাত্র রাবণকে পংকলিপ্ত করবে । কবির কাছে দশানন অর্থ "দশদিক হ'তে আলো অসংকোচে' যে অন্বেষণ করে ।[৩১]

আবার রামের প্রতিও তিনি বিরূপ নন। তাকে তিনি 'কবে কার মাঝে' পাবেন জানেন না। কিন্তু তাঁর 'শ্রীরাম' যেন নিজের গ্রহণযোগ্য সত্য খুঁজে পাবার কিছু অবসর পান। লক্ষণকে নিয়েও তিনি কবিতা লেখেন। তাঁর হৃদয় নিশ্চয় উতলা হয়েছিল যতই না 'শপথের তীব্র তাপে' তাকে তিনি শুষ্ক শিলা করে তুলতে চেয়েছেন।

মার্কসবাদে প্রত্যয়ী সুকান্ত ভট্টাচার্য 'সব্যসাচী' কবিতায় রূপকের মাধ্যমে নয়, মহাভারতের বীর অর্জুনকে আহ্বান করেছেন পৃথিবীকে নির্মল করতে এবং সম্বোধন করছেন বন্ধু বলে।

'নেমে এসো - হে ফাল্গুনী
বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
ক্লান্ত দুবাহু তব লৌহময় হোক
বয়ে যাক শোণিতের মন্দাকিনী স্রোত।'

কারণ

তুমি শুধু নহ সব্যসাচী / বিস্মৃতিতর অন্ধকার পারে
ধূসর গৈরিক নিত্য / প্রান্তহীন বেলাভূমি পরে
আত্মভোলা, তুমি ধনঞ্জয়। (ঘুম নেই)

অন্যত্র দেখা যায় —

দিগ্বিজয়ী দু:শাসন
আজ হোক তোমার বিচার।
দেখ ঘরে জেগে ওঠে এক এক ভীম। (দিনবদলের পালা)[৩২]

মন্বন্তরের প্রসঙ্গে তাঁর মনে অহল্যার মিথ জেগে ওঠে।

অহল্যা হল এই দেশ কোন পাপে
ক্ষুধার কান্না কঠিন পাথরে ঢাকা।
* * * * * * * *
অহল্যা আজ কাঁপে কি পাষাণকায়
রোমাঞ্চ লাগে পাথরের প্রত্যঙ্গে,
রামের পদস্পর্শ কি লাগে গায় ?
অহল্যা যেন আমার তোমার সঙ্গে।

রবীন্দ্রভক্ত সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের প্রতি নানা কবিতায় তাঁর প্রণাম জানিয়েছেন। 'পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশ্যে' কবিতায় তিনি এ ভারতকে জটায়ু বলছেন যে রাম-রাবণের যুদ্ধে বিক্ষত মৃতপ্রায়, 'পীড়নে-দুর্ভিক্ষে মৌনমূক।' তাঁর সূর্যপ্রণাম কবিতাগুচ্ছের সূর্য রবীন্দ্রনাথ। ভাবগাম্ভীর্য রক্ষার জন্য অনিবার্যভাবে মিথের উপস্থিতি ঘটেছে।

'হঠাৎ বুঝি তোমার রথের সাতটি ঘোড়া উঠল
হ্রেষা রবে চঞ্চল হয়ে, যাবার ডাক শুনি। (আয়োজন)[৩৩]

এবং উপনিষদিক প্রভাব স্বীকার করে রচিত

'নমো রবি, সূর্য দেবতা
জয় অগ্নি-কিরণময় জয় হে
সহস্র-রশ্মি বিভাসিত
চির অক্ষয় তব পরিচয় হে।' (প্রণতি)[৩৪]

সুকান্তের থেকে বয়সে কিছু বড়ো কিন্তু একই মতাদর্শে বিশ্বাসী সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা, সমকালীন সমস্যা তাড়িত করেছে। তিনি সযত্নে ভাববিহ্বলতা থেকে মুক্ত হয়ে কখনও লঘু, কখনও চটুলভাবে গভীর সামাজিক সমস্যা কবিতার বিষয়বস্তু করেছেন। আদ্যন্ত কবি হয়েও তিনি বেছে নিয়েছেন মুখের ভাষা, চলমান জীবনের অজস্র সাংসারিক ছবি। পৌরাণিক গাম্ভীর্যের পরিমণ্ডল থেকে দূরে থাকতে চাইলেও এসেই গেছে

সারাটা শহর করছে থমথম
গুপ্তকক্ষে বসে বসে নিজের অস্থিতে
বজ্র যেন বানাচ্ছে দধীচি।[৩৫]

উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থের দুই সংখ্যক কবিতাটি সুভাষের নিজস্ব স্টাইলটি নিখুঁত ভাবে ফুটে উঠেছে

যদিও আবাল্য চোখে
দেখে আসছি কম
ইদানীং ডান কানে
ইস,

একদম শুনছি না —
দ্রোণাচার্য তুচ্ছজ্ঞানে
নেননি ভাগ্যিস
বাল্যে বুড়ো আঙুল দক্ষিণা ।

এই কবির "সাধ" দু দেওয়ালে রুজু রুজু দুটো ছবি থাকবে —

'একটিতে কাঁটায় বিদ্ধ
যীশুখৃস্ট
অন্যটিতে
হেলায় করেন কর্ণ মৃত্যুতে বরণ
রথের চাকায় হাত রেখে ।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত কবিতা 'ছেলে গেছে বনে'র [৩৬] শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি যখন পড়ি —

ফেলে গেছে আমাকে বন্ধনে । ছেলে গেছে বনে
অথচ তারই হাতে দেখেছি মুক্ত পাখা
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত । আমারই পতাকা

তখন অবধারিত রূপে দশরথের পুত্রবিয়োগকাতর অথচ ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন পুরাণ চরিত্র মনে আসে । এইভাবেই মিথ আধুনিক সমাজসচেতন কবির কাছে নব আঙ্গিক বহন করে আনে ।

মহাভারতের পাঁচজন স্বল্প পরিচিতা নায়িকা সুলভা, সুভ্র, শ্রুতাবতী, মাধবী ও উর্বশীকে নিয়ে 'প্রণয়ী-পঞ্চক' নামে কাহিনী কবিতা রচনা করেছেন সুশীল রায় ।

বর্তমান কালে শক্তিশালী কবির সংখ্যা কম নয় । সাধারণভাবে যে-কোনো কাব্যসংগ্রহের পৃষ্ঠা পরিবর্তনে মিথের ব্যবহার দেখা যায় । যেমন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'ঘোড়া' কবিতায় অশ্বমেধের ঘোড়া । 'এ কেমন বিদ্যাসাগর' কবিতায় বৃত্রাসুরের উল্লেখ, 'পিতামহ' কবিতায় মৌলিক নিষাদ প্রসঙ্গ । তাঁর কয়েকটি অতি শক্তিশালী কবিতার 'উলঙ্গ রাজা', 'ঈশ্বর ঈশ্বর' 'নরকবাসের পর্ব' এবং সেই নিষ্পাপ ধুলোমাখা উলঙ্গ শিশু যে প্রকৃতই কলকাতার যীশু, যার টলোমলো পায়ে চলায় স্তব্ধ হয় ব্যর্থ জীবনের যাত্রাপথ ।

শঙ্খ ঘোষের 'দুই হাত দুই প্রান্ত' কবিতায় নীরেন্দ্রনাথের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি', 'মধ্যদিনে এসপ্ল্যানেডে দারুণ ধায় মানুষ বিহীন ট্রাফিক' । তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের নাম 'নিহিত পাতাল ছায়া' । অন্য কাব্যগ্রন্থ 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' -এর নাম ভূমিকায় পাওয়া যাচ্ছে 'হায় তুমি অন্নপূর্ণা আজ'। আরুণি-উদ্দালকজাবাল সত্যকাম তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে ।

বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার কবিতা । বহু শক্তিশালী কবি এসেছেন । আজও অনেকের সৃষ্টির স্রোত অব্যাহত । কাজেই আলাদা আলাদা করে তার মুখ্য সারির কয়েকজনকে নিয়ে আলোচনা না করে একটি পক্ষীদৃষ্টি (Bird's eye view) নেওয়া যেতে পারে । 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিতার পঞ্চপ্রদীপ' । এখানে বর্তমান কালের প্রতিভূ স্বরূপ যে পাঁচজন কবির দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে তার বিষয়বস্তু অনুধাবন করলে দেখা যায় মিথ এখনও কী প্রবল ও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন একটি সংলাপ কাব্য 'নন্দন কাননে দ্রৌপদী' । 'সৌতি কথনে' জয়দেব বসু পুরাণ থেকে কাহিনী ও উপমা গ্রহণ করেছেন নিজের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করতে । জয় গোস্বামীর মিথ চিন্তা আরও নিহিত । উর্বরতামিথ প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেখানে –

"বসুন্ধরা তাঁর দুগ্ধমুখ মুক্ত করে দেন
আর মাটির তলায়, ফোয়ারার মত উপছে ওঠে দুধ
পরদিন ভোরে, কী যেন মন্ত্রবলে দেখা যায়
ভিজে উঠেছে, ভিজে উঠেছে সমস্ত শুকনো মাটি ।
ভিজে উঠেছে, এমন কি মরুদেশ
তখনই উর্বরতা উঠে পড়ে তার ঘুম ভেঙে, আর
মাঠের পর হানা দিতে থাকে লাখো লাখো অঙ্কুর
ক্ষেতের পর ক্ষেত ভেসে যায় ধানে আর ধানে ।"

(সব চেয়ে উঁচু তারাকে আমি বলি)

সূত্র নির্দেশ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "উদ্‌বোধন", 'নবজাতক' রবীন্দ্র-রচনাবলী, (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার) তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬৭৭ ।

২। মধুসূদন দত্ত রচনাবলী সমগ্র, সুরেশচন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত । মডেল পাবলিশিং হাউস ।

৩। সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস - ইস্টার্ন পাবলিশার্স - প্রথম খণ্ড, পূর্বার্দ্ধ, ষষ্ঠ সংস্করণ - ১৯৭৮ ।

৪। মধুসূদন দত্ত রচনাবলী - মডেল পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের ৬০ নম্বর চিঠি, তারিখ বা স্থান নেই । পৃষ্ঠা ৩৩২ ।

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতকে গীতিকবিতা সংকলন - মডার্ণ বুক এজেন্সি ।

৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী চিত্রা, পৃষ্ঠা ৫২০ । জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ, ১ম খণ্ড ।

৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী পরিশিষ্ট কবিতা সুপ্রভাত, পৃষ্ঠা ৯২১, তৃতীয় খণ্ড ।

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী 'ব্রাহ্মণ' কথা, পৃষ্ঠা ৬১৮, ১ম খণ্ড

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী 'কল্পনা' পৃষ্ঠা ৭২১ । ঐ ১ম খণ্ড ।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ভাষা ও ছন্দ কথা পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৯১৪ ৩য় খণ্ড

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী, ১ম খণ্ড, 'মানসী', পৃষ্ঠা ৩২৫ ।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী, 'ছিন্নপত্র' ৬৪ সংখ্যক চিঠি, ১১শ খণ্ড ।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী, ২য় খণ্ড, 'উৎসর্গ', ১৩ সংখ্যক কবিতা, পৃষ্ঠা ৮৮

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - রচনাবলী, ১ম খণ্ড, 'সোনার তরী', পৃষ্ঠা ৩৭৮, পৃষ্ঠা ৪৩৪ ।

১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - আকাশপ্রদীপ - যাত্রাপথ কবিতা-র রচনাবলী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩৫

১৬। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার - "রামায়ণ ও রবীন্দ্রপংক্তি" - 'রাতের তারা দিনের রবি' - প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স, পৃষ্ঠা ৫২৭ ।

১৭। কাজী নজরুল ইসলাম - সঞ্চিতা (ডাটা-পূণিমা প্রকাশিত, নবম সংস্করণ জৈষ্ঠ্য ১৩৬২) পৃষ্ঠা ১ ।

১৮। কাজী নজরুল ইসলাম, ঐ (অগ্নিবীণা কাব্য) ঐ পৃষ্ঠা ২১২

১৯। নজরুল ইসলামের চিত্তনামা কাব্য, পৃষ্ঠা ১৬২

২০। নজরুল ইসলামের চিত্তনামা কাব্য

২১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কাব্যসঞ্চয় (এম·সি· সরকার এণ্ড প্রা: লি: ৮ম সংস্করণ, ১৯৫৭)

২২। অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোলযুগ

২৩। মোহিতলাল মজুমদার, মোহিতলালের কাব্য : প্রকাশক জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রথম সংস্করণ ।

২৪। ঐ

২৫। বুদ্ধদেব বসু, যেদিন ফুটল কমল, দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৬ ।

২৬। বুদ্ধদেব বসু, সংক্রান্তি : কাব্যসংগ্রহ, সম্পাদনা নরেশ গুহ, দে'জ পাবলিশিং, ৭ম সংস্করণ, ১৯৮৬ ।

২৭। বুদ্ধদেব বসু, অনাম্নী অঙ্গনা, দে'জ সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ ।

২৮। দীপক চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম, দে'জ পাবলিশিং প্রা: লি: ।

২৯। বিষ্ণু দে, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', নাভানা, প্রথম মুদ্রণ : জুন ১৯৫৫ কাব্য, চোরাবালি পৃষ্ঠা ৩০ ।

৩০। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — আধুনিক বাংলা কবিতা, প্রকাশক সুপ্রিয় সরকার এম·সি· সরকার, এ্যাণ্ড সন্স (প্রা:) দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯৪ ও পৃষ্ঠা ৯৮ । ঐ সংবর্ত কাব্য ।

৩১। প্রেমেন্দ্র মিত্র, সাগর থেকে ফেরা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রা: কো: লি:

৩২। ঐ, ঐ, ঐ পৃষ্ঠা ৫৬, পৃষ্ঠা ৩৬
ঐ হরিণ-চিতা-চিল, ত্রিবেণী প্রকাশন, পৃষ্ঠা ৩৬ ।

৩৩। সুকান্ত ভট্টাচার্য, ঘুম নেই

৩৪। সুকান্ত ভট্টাচার্য, দিনবদলের পালা

৩৫। সুকান্ত ভট্টাচার্য, আয়োজন

৩৬। সুকান্ত ভট্টাচার্য, প্রণতি, ঐ